



A Peer-Reviewed Article

ISSN: 3136-9049

eISSN: 3136-9057

North Bengal International
University Journal

<https://journal.nbiu.edu.bd>

বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্ম: পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ
নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রচারণা কৌশলের প্রকৃতি ও প্রভাব

Religion in Electoral Politics in Bangladesh: The Nature and
Impact of the Awami League's Campaign Strategies in the
Fifth and Seventh National Parliamentary Elections

Hafij Ahmed*

Abstract

This article is focusing that religion is playing an important and sensitive role in electoral politics in Bangladesh. This study analyzes the use of religion, its nature and impact in the electoral campaigns of the Awami League during the fifth (1991) and seventh (1996) national parliamentary elections. Utilizing a qualitative research approach, that examines campaign speeches, posters, slogans, newspaper reports, and relevant secondary sources. The findings indicate that although the Awami League has historically upheld a secular ideology, it strategically employed religious rhetoric and symbols in specific political contexts. This usage had a notable impact on voter behavior, the construction of political identity, and the dynamics of electoral competition. The study also contributes an analytical understanding of the interplay between religion and politics in electoral landscape of Bangladesh.

Keywords: Religion in Electoral Politics, Fifth and Seventh Parliamentary Elections, Awami League, Political impact.

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ধর্ম একটি সংবেদনশীল এবং প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি মৌলিক নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও, পরবর্তীকালে সামরিক শাসনামলে (বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং এরশাদের সময়কালে) সংবিধানে ধর্মীয় রাজনীতির

*Associate Professor, History and Civilization Discipline, Khulna University; PhD Fellow, Department of Islamic History and Culture, University of Rajshahi, Bangladesh.

উত্থান এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।^১ এই পরিবর্তন বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মকে একটি শক্তিশালী প্রতীকি ও আবেগ-উদ্দীপক হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যা রাজনৈতিক দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভোটারদের ধর্মীয় পরিচয় ও আবেগকে সক্রিয় করতে ব্যবহার করেছে।

আওয়ামী লীগের আদর্শগত বিবর্তনও এই পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠাকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া মেনিফেস্টোতে ১১টি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিলো যার মধ্যে অন্যতম হলো- ‘বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জোরদার করা, প্রতিবেশী দেশগুলির পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে মুসলিম দেশগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও জোরদার করা।’^২ ১৯৫৪ সালে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে ১৬টি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়, যার মধ্যে অন্যতম হলো- ‘গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হইবে। কোরআন ও সুন্নাহ মূলনীতির বিরুদ্ধে কোন আইন রচিত হইতে পারিবে না।’^৩ অর্থাৎ শুরুতে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯৫৫ সালের কাউন্সিলে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেওয়া হয় এবং অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আওয়ামী লীগ।^৪ পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে দলটি গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংশোধন করে। এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ-মুজিববাদ এই চারটি মূল নীতির ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কয়েম করিয়া বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তির সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহায়তা করা।^৫

এই সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার রাজনৈতিক দলের দিকে ধাবিত হয়। দলটির মূল আদর্শে ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখার প্রতিশ্রুতি থাকলেও, নির্বাচনী প্রতিযোগিতার চাপে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় সচেতনতাকে বিবেচনায় নিয়ে কৌশলগতভাবে ধর্মীয় বয়ান, প্রতীক এবং আবেদন ব্যবহার করেছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১) এবং সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬) এই দ্বৈততার স্পষ্ট উদাহরণ। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর জোর দিলেও বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ধর্মীয় আবেদন অধিকতর কার্যকরভাবে ব্যবহার করে নির্বাচনী সুবিধা অর্জন করে।^৬ পরবর্তীতে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক কৌশল পুনর্বিন্যাস করে তুলনামূলক নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করে, যেখানে ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে বরং তা সম্মান প্রদর্শনমূলক রূপে ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনা করে। উল্লেখ যে, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন^৭ স্বল্পস্থায়ী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের লক্ষ্যে সীমিত ছিল; তাই গবেষণার আলোচনায় পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রধান বিবেচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী

লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহারের প্রকৃতি (যেমন: নির্বাচনী ভাষণে ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার, স্লোগান এবং পোস্টারে ধর্মীয় আবেদন) এবং নির্বাচনী ফলাফলের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণাটি গুণগত, বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে এবং পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে তুলনামূলক কেস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে নির্বাচনী ভাষণ, পোস্টার, লিফলেট, স্লোগান এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্তব্য ও প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত; দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে গবেষণামূলক বই, প্রবন্ধ, জার্নাল নিবন্ধ, থিসিস ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রকাশনা ব্যবহার করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত ধর্মীয় ভাষা, প্রতীক ও বয়ানের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্ম ও রাজনৈতিক কৌশলের জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচারণায় ধর্মীয় কৌশলের প্রকৃতি

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রথম অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই নির্বাচনে জনগণের সমর্থন পাওয়ার জন্য ধর্ম একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী প্রচারণায়- পোস্টার, স্লোগান, বক্তৃতা, জনসভা প্রভৃতিতে দক্ষিণপন্থা রাজনীতির অন্যতম উপাদান ধর্মের ব্যবহার করে। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হলো-

(i) নির্বাচনী ভাষণে: এই নির্বাচনে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিসহ অধিকাংশ দল ধর্মকে তাদের প্রচারণার অংশে পরিণত করেছিল। ৭ জানুয়ারি নির্বাচনী তফশীল ঘোষণার পূর্ব থেকেই এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাজনৈতিক দলসমূহের শীর্ষ নেতৃত্বসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সারাদেশে নির্বাচনী প্রচারণায় নানাভাবে ধর্মের ব্যবহার করেন।

১৯৯১ সালের ১ জানুয়ারি জামায়াত নেতা মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী যশোরের কেশবপুরে বলেন, “ধর্মনিরপেক্ষতার জিকির তুলে ইসলামী আকিদা পালনে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ ইসলামী হুকুমাত কায়েমের মাধ্যমেই দেশে সত্যিকারের শোষণমুক্ত ও ন্যায় বিচারের শাসন কায়েম করা সম্ভব।”^৮ ৩ জানুয়ারি কামাল আতাতুর্কি এভিনিউস্থ কার্যালয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, “ধর্ম সম্পর্কে সংবিধানে যা আছে তা থাকবে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা চাই না।”^৯ অন্যদিকে ৫ জানুয়ারি আঞ্জুমান-ই-তরিকত এর চেয়ারম্যান মওলানা সৈয়দ নজিবুল বশর আল হাসানী আল মাইজভারীর নেতৃত্বে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকালে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, “ধর্মের মর্মার্থই হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা।”^{১০} ২৬ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জে এক জনসভায়

ভাষণদানকালে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, “আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে এদেশে ধর্ম-কর্ম বন্ধ করে দেবে। চারিদিকে সৃষ্টি হবে হাহাকার আর দুর্ভিক্ষ।”^{১১} এ সকল বক্তব্যের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির সমালোচনা করেন এবং ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিয়ে ধানের শীষে ভোট প্রদানের আহ্বান জানান। এরূপ প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারণা জনসভায় উল্লিখিত বক্তব্যের সমালোচনা করে ভাষণ প্রদান করেন। ২৭ জানুয়ারি চট্টগ্রামের আনোয়ারায় জনসমাবেশে ৮ দলীয় জোট ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বলেন-

আজ একটি মহল জনগণকে ধাপ্লা দেওয়ার জন্য যখনই সুযোগ পায় ‘ইসলাম গেল গেল’ রব উঠায়। ধর্মনিরপেক্ষতার ভুল ব্যাখ্যা দেয়। তিনি বলেন, ইসলাম হতেই আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা শিখেছি। মুসলিম বিশ্বের নেতা ইয়াসির আরাফাত যদি ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্বাসী হন এবং ইসলাম বিরোধী না হন তবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললে এত আপত্তি কেন? ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়। সকল মুসলমানই মনে মনে বিসমিল্লাহ বলিয়া কাজ শুরু করে। তাই বিসমিল্লাহর সাথে ধর্ম নিরপেক্ষতার কোন সংঘাতের প্রশ্ন নাই।^{১২}

এই বক্তব্যের মাধ্যমে শেখ হাসিনা প্রতিপক্ষের ‘ইসলাম গেল গেল’ রবকে ‘ধাপ্লা’ (মিথ্যা প্রচার) বলে সমালোচনা করেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলামের অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে ইয়াসির আরাফাতের উদাহরণ দিয়ে এর ইসলাম-সমর্থিত বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে ‘ধর্মহীনতা’ নয় বলে স্পষ্ট করেন। পরিশেষে, ‘বিসমিল্লাহ’ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোনো সংঘাত নেই বলে যুক্তি দেন।

৩১ জানুয়ারি’৯১ শেখ হাসিনা রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় (মোহনপুর, বাগমারা, পুঠিয়া, চারঘাট, বাঘা) অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করেন। ভবানীগঞ্জ মাঠে বক্তৃতাকালে তিনি ধর্মের নামে রাজনীতি বন্ধ করে গণমানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “ক্ষমতায় গেলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র পুনর্বহাল হবে...ইসলামেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা পরিষ্কারভাবে বলা আছে। আমি নিজেও মুসলমান, ওমরা হজ্জ পালন করেছি। পাকিস্তানে যদি মহিলা প্রধানমন্ত্রী হতে পারে তাহলে বাংলাদেশে মহিলারা কেন রাজনীতি করতে পারবেনা।”^{১৩} এ বক্তৃতার মাধ্যমে শেখ হাসিনা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মীয়ভাবে বৈধতা দান, নিজেকে ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও নারী নেতৃত্বে ধর্মীয়ভাবে বৈধ হিসেবে প্রতিষ্ঠার এবং সেই সাথে জনগণের অস্থা ও সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছেন।

নির্বাচনী মাঠে এরূপ পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ ফেব্রুয়ারি বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রামের হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড মাঠে এক বিশাল জনসভায় বলেন, “একটি দল আছে যারা দেশকে বিক্রি করে দিতে চায়। এই দল ক্ষমতায় গেলে সংবিধান থেকে আল্লাহর নাম তুলে দেবে।”^{১৪} এর জবাবে ৮

ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে এক বিশাল জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন,

বঙ্গবন্ধু সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন করলেও মদ-জুয়া বন্ধ করেছিলেন। জিয়া সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন করে দেশে ৫৬০টি মদের লাইসেন্স এবং এরশাদ রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম করে হেরোইন আমদানি করেছেন। তিনি আরো বলেন, অনেকে বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে না-কি ধর্ম থাকবে না! তাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই- আপনাদের রাজনীতির বয়স কতো? ৭৮ সালে বিএনপি এবং ৮৫ সালে জাতীয় পার্টি গঠিত হয়েছে। তার আগে কি বাংলাদেশে ধর্ম ছিল না?^{১৫}

এ ভাষণে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির পক্ষে যৌক্তিক মতামত তুলে ধরেন এবং ধর্মের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য যে, ৩০ জানুয়ারি রাজশাহীর সাহেব বাজার অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ হাসিনা অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। ১১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ বিরোধী সমালোচনার জবাবে শেখ হাসিনা বলেন-

বিএনপিকে ভোট না দিলে নাকি এদেশে ধর্ম থাকবে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন বিএনপির জন্ম '৭৯ সালে। এর পূর্বে এদেশে কি ধর্ম ছিল না? এ দেশের ধর্মভীরু মুসলমানদের মুখ হতে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও বিসমিল্লাহ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। শেখ হাসিনা বলেন, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও উপজাতি জনগণ মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। পরে বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বরং ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামেরই মর্মবাণী।^{১৬}

এ বক্তব্যের মাধ্যমে শেখ হাসিনা বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার আওয়ামী বিরোধী প্রচারণা বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে ধর্ম থাকবে না, এর সমালোচনা করে ইতিহাসের আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন। সেই সাথে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদকে ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি মাদারীপুরের শিবচরে তিনি পুনরায় ব্যক্ত করে বলেন, “নৌকায় ভোট দিলে ইসলামও থাকবে বিসমিল্লাও থাকবে।”^{১৭}

এ সময় দলের সংসদ প্রার্থীরাও তাদের প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার করেন। ফেনী-১ আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাকারিয়া ভূঁইয়া এলাকার নির্বাচনী প্রচারণার এক নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তিনি এই আসনের প্রায় আড়াইশ জামে মসজিদে তাকে জয়ী করার লক্ষ্যে মিলাদ ও দোয়ার মাহফিল করেন। তার মতে এলাকার সরলপ্রাণ ও ধর্মপ্রাণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এটাই সহজ পদ্ধতি।^{১৮}

(ii) দেয়াল লিখনে: ১৯৯১ সালের নির্বাচনে দলগুলোর দেয়াল লিখনে ধর্মের ব্যবহার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়দানকারী আওয়ামী লীগও দেয়াল লিখনে ধর্মীয় শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচারণা চালায়। যেমন-

➤ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নৌকার মালিক তুই আল্লাহ (স্ত্রিচিট্র-১)।’^{১৯}



স্ত্রিচিট্র-১, উৎস: দৈনিক মিল্লাত, ১২ জানুয়ারি ১৯৯১

উল্লিখিত দেয়াল লিখন-‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নৌকার মালিক তুই আল্লাহ’ এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রতীক নৌকাকে সরাসরি ইসলামী কালেমা (তাওহীদের সাক্ষ্য) এবং আল্লাহর সাথে যুক্ত করে একটি ধর্মীয় আবেদন তৈরি করে জনসমর্থনের চেষ্টা করেছে।

(iii) মাজার জিয়ারত: বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে মাজার জিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী অনুষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পীর, দরবেশ ও সুফি-সাধকদের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে তাঁদের নির্বাচনী প্রচারণা সূচনা করেন, যা ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জনমানসের সাথে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপনের একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৯১ সালের ১৬ জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়া সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার জিয়ারতের পর সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।^{২০} অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ২১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন (স্ত্রিচিট্র-২)।^{২১} খালেদা জিয়া সরাসরি তার নির্বাচনী প্রচারণার সূচনা করেন প্রখ্যাত সুফি-সাধক হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে। যার স্পষ্ট ও প্রতীকী বার্তা ছিল। সেটি হলো ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে নিজেসব এবং তার দলকে সরাসরি যুক্ত করছেন। অন্যদিকে শেখ হাসিনা প্রচারণা শুরু করেন তার পিতার (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে, যা একটি পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রকাশ। এটি মূলত দলীয় আদর্শ (বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার) এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সাথে সংগতিপূর্ণ। তবে এই সূচনায় সুফিবাদী বা লোকধর্মীয় কোনো প্রতীক সরাসরি যুক্ত না থাকায় গ্রামীণ ও ধর্মপ্রভাবিত জনগোষ্ঠীর আবেগকে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপকভাবে স্পর্শ করতে তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর হয় বলে প্রতীয়মান হয়। তবে শেখ হাসিনা যে সুফি-সাধকদের মাজার জিয়ারত থেকে বিরত ছিলেন-এমনটি নয়। বরং নির্বাচনী প্রচারণাকালে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সুফি-দরবেশদের মাজার জিয়ারত করেন। শেখ হাসিনা ৪ ফেব্রুয়ারি সিলেটের হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহপারান (রহ.) (স্ত্রিচিট্র-৩)^{২২}, ৮ ফেব্রুয়ারি

শাহজাদপুরে হযরত মখদুম শাহ দৌলা (রহ.) ও হযরত শাহ শামসুদ্দিন তাবরেজী (রহ.)^{২৩} এবং ১০ ফেব্রুয়ারি রংপুরের ধাপেরহাটে হযরত শাহ সূফী নায়েব উল্লাহ এর মাজার জিয়ারত করেন।^{২৪} এ সকল ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নির্বাচনী প্রচারণায় যেখানেই গমন করেছেন, সেখানকার নিকটবর্তী কোনো সুফি-সাধকের সমাধি থাকলে তা জিয়ারত করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এটি ইঙ্গিত করে যে, প্রচারণার অগ্রগতির সাথে সাথে তিনি নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রতীকের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং বাস্তব রাজনৈতিক প্রয়োজনে সেই প্রতীকসমূহকে কৌশলগতভাবে তাঁর প্রচারণার অংশে পরিণত করেন।



স্থিরচিত্র-২, উৎস: দৈনিক বাংলার বাণী, ২৩ জানুয়ারি ১৯৯১



স্থিরচিত্র-৩, উৎস: দৈনিক খবর, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

(iv) নির্বাচনী শ্লোগানে ধর্মের ব্যবহার: এই নির্বাচনে ধর্মীয় শ্লোগানের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনকালীন অনেক ভোটের ধর্মীয় অনুভূতির উপর ভিত্তি করে তাদের ভোট প্রদান করে। এই কারণে, আওয়ামী লীগ ধর্মীয় শব্দ সম্বলিত শ্লোগান ব্যবহার করে ভোটদারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। নিম্নে এ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো-

- ‘আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর, নৌকা মার্কাই সীল মার।’^{২৫}
- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নৌকার মালিক তুই আল্লাহ।’^{২৬}
- ‘যাহা করে আল্লায়, ভোট দেবে নৌকায়।’^{২৭}

এসব শ্লোগানে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, জিকির ও কালেমার মতো ধর্মীয় বাক্যাংশকে সরাসরি একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনী প্রতীকের (নৌকা) সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ভাষাগতভাবে এগুলো ছন্দময়, সহজবোধ্য ও স্মরণযোগ্য, যা লোকজ সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার উপযোগী। এর মাধ্যমে ভোটদারদের আচরণ প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

(v) নির্বাচনী পোস্টারে ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার: ১৯৯১ সালের বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনী পোস্টার ও প্রচারণায় ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার ছিল লক্ষণীয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এর প্রার্থীরা তাদের

পোস্টারে-ব্যানারে ‘আল্লাহ আকবর’, ‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে’ ইত্যাদি স্লোগান লিখে মুসলিম ভোটারদের সমর্থন আদায়ের কৌশল গ্রহণ করেন।^{২৮} অন্যদিকে বিএনপি’র প্রার্থীরা তাদের প্রচারণা পোস্টারে ‘বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’, ‘আল্লাহ আকবর’ এবং ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’ উল্লেখ করে।^{২৯} বাংলাদেশ একটি মুসলিম-প্রধান দেশ। ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পরিচয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার করেছে যাতে: ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হয়, প্রার্থীর প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে-এই বার্তা দেওয়া যায়।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচারণায় ধর্মীয় কৌশলের প্রকৃতি

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১২ জুন ১৯৯৬) ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিতে অনুষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা কৌশল ব্যবহার করে, যার মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি, প্রতীক ও ভাষাকে বিশেষভাবে কাজে লাগানো হয়। ধর্মীয় কৌশলের প্রকৃতি নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়-

(i) নির্বাচনী ভাষণে: আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ দল হলেও নির্বাচনী প্রচারণায় দলীয় প্রধানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ধর্মীয় শব্দের ব্যাপক ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ১৯৯৬ সালের ২৪ মে পঞ্চগড়ে শেখ হাসিনা বলেন, “জনগণের ম্যাডেট নিয়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা যদি ক্ষমতায় যাই তবে মানুষের জীবনের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।”^{৩০} ২৫ মে লালমনিরহাটে নৌকা মার্কায ভোট দেবার আহবান জানিয়ে বলেছেন, “পরম করুণাময়ের মেহেরবানী ও জনগণের ম্যাডেট পেলে নৌকা এবার শান্তি-শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেবে।”^{৩১} ১৭ মে ঢাকার মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আপনাদের কাছে আমার বিনীত আবেদন- মহানগরের প্রতিটি ঘরে ঘরে আপনারা যাবেন এবং শেখ হাসিনার সালাম পৌঁছে দেবেন।^{৩২} ৩১ মে ফেনীতে অপর এক জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, “আল্লাহর মেহেরবানীতে জনগণের ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সেই সরকার জনগণের সেবক হবে।”^{৩৩} ৫ জুন গোপালগঞ্জে বিশাল জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, “আল্লাহ তায়ালার রহমত ও ভোটারদের ইচ্ছায় আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় যায় তবে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।”^{৩৪} উল্লিখিত বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মীয় অনুভূতি এবং রাজনৈতিক বার্তাকে একীভূত করার কৌশল গ্রহণ করেছেন। এসব বক্তব্যে ‘আল্লাহর মেহেরবানীতে’ ও ‘আল্লাহ তায়ালার রহমত’ শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি ভোটারদের ধর্মীয় আবেগকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন, যা দক্ষিণপন্থী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একইসাথে তিনি ‘জাতীয় ঐকমত্য’, ‘জনগণের সেবক’ ইত্যাদি ধারণা তুলে ধরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনমুখী নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

(ii) মাজার জিয়ারত: ১৪ মে শেখ হাসিনা শাহজালাল (রহ.), শাহ পরান (রহ.) ও সৈয়দ বোরহান উদ্দিন (রহ.) এর মাজার জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ, কোরআন তেলাওয়াত ও নামাজ আদায় করে আওয়ামী লীগের বিজয়ের জন্য দোয়া করেন। একই দিন থেকেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণার কার্যক্রম শুরু করেন (চিত্র-৪)।^{৭৫} এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ মে তিনি বাগেরহাটে প্রখ্যাত আউলিয়া খান জাহান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন এবং দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণ কামনায় মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ মোনাজাত করেন (চিত্র-৫)।^{৭৬} ২২ মে ঢাকায় নির্বাচনী প্রচারের প্রথম দিনে মিরপুর হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রহ.) এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের রহমত কামনা করে শেখ হাসিনা ঢাকায় ব্যাপক গণসংযোগ শুরু করেন।^{৭৭} এর পরদিন ২৩ মে মতিবিল-সবুজবাগ থানার মনোনীত প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরীর পক্ষে মাদারটেকের জনসভায় যাওয়ার পূর্বে শেখ হাসিনা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে হযরত শাহ খাজা শরফুদ্দিন চিশতী (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। তিনি মাজারে মুসলিম উম্মাহর জন্য মোনাজাত করেন। এসময় আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ এবং ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ তার সঙ্গে ছিলেন।^{৭৮} ২৪ মে হাসিনা সৈয়দপুরে হযরত শাহ রিয়াজুদ্দিন (রহ.)^{৭৯} এর মাজার, ২৬ মে শেখ হাসিনা বগুড়ার মহাস্থানের শাহ সুলতান বলখী (রহ.) এর মাজার, ৩ জুন ফেনীর পাগলা মিয়ার মাজার জিয়ারত করেন।^{৮০} দলীয় প্রধানের পথ অনুসরণ করে অন্যান্য নেতৃবৃন্দও নিজ এলাকার মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। উদাহরণস্বরূপ, ১ জুন ঢাকা-১০ আসনের প্রার্থী ডা. এইচ বি এম ইকবাল পরীবাগ মাজার জিয়ারত শেষে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।^{৮১} উপর্যুক্ত ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের নির্বাচনী প্রচারণার সূচনায় বিভিন্ন মাজার জিয়ারত কেবল ধর্মীয় আচার ছিল না; বরং এটি ছিল একটি সচেতন ও সুপরিচালিত রাজনৈতিক কৌশল। এই কৌশলের মাধ্যমে তারা-ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনৈতিক যোগাযোগে ব্যবহার করেছেন, নিজেদের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি পবিত্রতা, নৈতিকতা ও গণ-আস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার সাংকেতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক সমর্থনে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন।



ছিরচিত্র-৪, উৎস: THE BANGLADESH OBSERVER, 15 May 1996



ছিরচিত্র-৫, উৎস: দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ মে ১৯৯৬

(iv) নির্বাচনী শ্লোগানে ধর্মের ব্যবহার: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ধর্মীয় শব্দের সমন্বয়ে যেসব শ্লোগান ব্যবহার করে সেগুলো হলো-

- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নৌকার মালিক তুই আল্লাহ।’^{৪২}
- ‘আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর, নৌকা মার্কায় সীল মার।’^{৪৩}

তাওহিদের মূল বাণী—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—কে রাজনৈতিক প্রতীকের (নৌকা মার্কা) সঙ্গে যুক্ত করেছে। এর লক্ষ্য হলো নৌকা মার্কাকে ‘আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত’ বা ‘ধর্মসম্মত’ প্রতীকের মতো উপস্থাপন করা। আবার ‘আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর, নৌকা মার্কায় সীল মার।’ শ্লোগানটি ধর্মীয় আচার (জিকির) এবং রাজনৈতিক আচরণ (সীল মারা)—কে এক করে একটি ‘চেইন বিহেভিয়ার’ তৈরি করেছে।

(v) নির্বাচনী পোস্টারে ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার: যদিও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মীয় উল্লেখ বা ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিধিনিষেধ প্রদান করেছিল, তবুও অনেক প্রার্থী-সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে-পোস্টার, ব্যানার এবং অন্যান্য দৃশ্যমান প্রচারণা সামগ্রীর মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগানোর কৌশল গ্রহণ করেন। বিএনপি-সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা তাদের পোস্টারে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’, ‘আল্লাহ আকবর’ এবং ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’^{৪৪} (চিত্র-৬) -এর মতো ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী উচ্চারণ ব্যবহার করেন, যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের আবেগকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা তাদের পোস্টারে-ব্যানারে ‘আল্লাহ আকবর’, ‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে’^{৪৫} (চিত্র-৭) ইত্যাদি বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়, যা সরাসরি ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতি আবেদন তৈরি করে। এই শব্দচয়নে তারা মুসলিম ভোটারদের কাছে নিজ দল ধর্মবিরোধী নয় এমন বার্তা দিতে এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমালোচনার জবাব দিতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী পোস্টারে, ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’, ‘নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবর’, ‘আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন চাই’^{৪৬} (চিত্র-৮) লিখে মুসলিম ভোটারদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।



ছবিচিত্র-৬, উৎস: দৈনিক বার্তা, ৬ জুন ১৯৯৬



ছবিচিত্র-৭, উৎস: দৈনিক দিনকাল, ৯ জুন ১৯৯৬



ছবিচিত্র-৮, উৎস: দৈনিক সংগ্রাম, ৪ জুন ১৯৯৬

(vi) প্রচারণায় শেখ হাসিনার ধর্মীয় আবরণ গ্রহণ: নির্বাচনের পূর্বে সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার পরিবারের ১০ জন সদস্যসহ ১৯৯৬ সালের ২৩ এপ্রিল হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করেন এবং ১ মে দেশে ফিরে আসেন।^{৪৭} হজ্জ পালন শেষে শেখ হাসিনা মাথায় কালো রঙের হিজাব পরিহিত অবস্থায় দেশে আগমন করেন এবং পরবর্তীতে প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচীতে তাকে

হিজাব পরিহিত অবস্থায় যোগদান করতে দেখা যায় (চিত্র-৪, ৫, ৯, ১০)। এছাড়াও নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনার হিজাব পরিহিত, তসবিহ হাতে এবং মোনাজারত ছবি সম্বলিত পোস্টারে সারাদেশ ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি নির্বাচন পরবর্তী শপথগ্রহণের সময়ও হিজাব পরিহিত ও তসবিহ হাতে দেখা যায় (চিত্র-১০)। শেখ হাসিনার হিজাব পরা, তসবিহ হাতে রাখা এবং মোনাজারত ছবি ব্যবহার করা ছিল প্রতীকী রাজনীতির (symbolic politics) একটি শক্তিশালী উদাহরণ। কেননা হিজাব ও তসবিহ মুসলিম সমাজে ধর্মীয় পবিত্রতা, পরহেজগারি এবং ধর্মের প্রতি আনুগত্যের প্রতীক। এসব প্রতীক ব্যবহার নির্বাচনের আগে ভোটারদের মনে শেখ হাসিনার ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা আছে এমন ধারণা তৈরি করে। যা জনসমর্থন ও ভোট বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।



স্থিরচিত্র-৯: উৎস: ভোরের কাগজ ৩ মে ১৯৯৬



স্থিরচিত্র-১০: উৎস: দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ জুন ১৯৯৬

পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচারণা কৌশলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

১৯৯১ সালের পঞ্চম এবং ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার ও কৌশলগত অবস্থানের মধ্যে কিছু মৌলিক ও কাঠামোগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

(i) প্রতিরক্ষামূলক বনাম আক্রমণাত্মক/ইতিবাচক

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১): এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ধর্মীয় কৌশল ছিল মূলত প্রতিরক্ষামূলক। বিএনপি এবং জামায়াতের অভিযোগের জবাবে এটি গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ প্রচণ্ড আগ্রাসী ধর্মীয় প্রচারণার কৌশল গ্রহণ করেন। যেমন-আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ‘সংবিধান থেকে আল্লাহর নাম তুলে দেবে’, ‘দুর্ভিক্ষ হবে’, ‘ধর্মকর্ম বিপন্ন হবে’, ‘সংবিধানে বিসমিল্লাহ থাকবে না’^{৪৮} ইত্যাদি। অন্যদিকে শেখ হাসিনা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলামের মর্মবাণী হিসেবে ব্যাখ্যা করে বিএনপি ও জামায়াত নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, “ইসলাম হতেই আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা শিখেছি” এবং “ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়”। এছাড়া, বিএনপির জন্মের আগে দেশে ধর্ম ছিল না কি? এমন যৌক্তিক প্রশ্ন তুলে প্রতিপক্ষের অভিযোগকে খণ্ডন করেন। কৌশলটি ছিল প্রতিরক্ষামূলক, যাতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মীয়ভাবে বৈধতা দান এবং নিজের দলকে ধর্মপরায়ণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬): ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কৌশলটি আক্রমণাত্মক এবং ইতিবাচক, যাতে ধর্মীয় শব্দাবলী ব্যবহার করে সরাসরি ভোটারদের আবেগীয় সমর্থন লাভের চেষ্টা করা হয়েছে। শেখ হাসিনা নির্বাচনী জনসভাতে ‘আল্লাহর মেহেরবানীতে’, ‘পরম করুণাময় মেহেরবানী’ এবং ‘আল্লাহ তায়ালার রহমত’ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়াকে ঐশ্বরিক কৃপা এবং জনগণের ম্যাগেটের সাথে যুক্ত করেন। এটি প্রতিপক্ষের সমালোচনার জবাবের চেয়ে দলের প্রতিশ্রুতি (যেমন শান্তি, উন্নয়ন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ) কে ধর্মীয় আবেগের সাথে একীভূত করার উপর ফোকাস করে। প্রতিরক্ষার পরিবর্তে এটি ছিল ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনৈতিক বার্তার অংশ করে তোলা।

(ii) ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ফোকাস বনাম ধর্মীয় শব্দাবলীর উপর ফোকাস

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১): ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল আওয়ামী লীগের কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু। শেখ হাসিনা বারবার ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলামের সাথে যুক্ত করে ও ইয়াসির আরাফাতের উদাহরণ দিয়ে এর বিরোধিতাকে খণ্ডন করেন। তিনি নিজেকে ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করেন (হজ্জ, ওমরা পালনের উল্লেখ) এবং ঐতিহাসিক যুক্তি (যেমন বঙ্গবন্ধুর সময় মদ-জুয়া বন্ধ) দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বৈধ করেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা (যেমন জাকারিয়া ভূঁইয়া) মসজিদে মিলাদ-দোয়া করে স্থানীয় ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করেন, যা ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করার জন্য ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬): ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে সরাসরি আলোচনা কম, বরং ধর্মীয় শব্দাবলীর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় যাওয়াকে ‘আল্লাহর মেহেরবানী’ এবং ‘জনগণের ম্যাগেট’ এর সাথে যুক্ত করে, যা ধর্মীয় আবেগকে গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতির সাথে মিশিয়ে দেয়। দলের অন্য নেতারা (যেমন মোহাম্মদ হানিফ) সালাম পৌঁছে দেওয়ার মতো ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আহ্বান ব্যবহার করেন। এছাড়াও আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার থেকে শুরু করে পার্টির সকল দলিলে ‘আল্লাহ সর্বশক্তিমান’ এবং ‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি’ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক বাক্য ব্যবহার করেছে।^{৪৯}

(iii) ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক বনাম আবেগীয় ও প্রতিশ্রুতিমূলক

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১): আওয়ামী লীগের প্রচারণার কৌশলটি ঐতিহাসিক এবং যৌক্তিক যুক্তির উপর নির্ভরশীল। বিএনপির অভিযোগ “আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ধর্ম থাকবে না”^{৫০} এর জবাবে শেখ হাসিনা ইতিহাস উল্লেখ করেন বলেন- “বিএনপির জন্মের আগে কি ধর্ম ছিল না?” এবং তিনি আরো বলেন- “বিসমিল্লাহর সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো সংঘাত নেই।”^{৫১} এটি ছিল প্রতিপক্ষের ধর্মীয় অভিযোগকে খণ্ডন করে দলের অবস্থানকে শক্তিশালী করা।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬): যুক্তি আরও আবেগীয় এবং প্রতিশ্রুতিমূলক। প্রতিপক্ষের সমালোচনার পরিবর্তে শেখ হাসিনা ধর্মীয় শব্দ দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি দেন (যেমন- “আল্লাহর মেহেরবানীতে জনগণের সেবক হবে”)। এটি ভোটারদের ধর্মীয়

আবেগকে সরাসরি স্পর্শ করে, যা ১৯৯১-এর মতো প্রতিরক্ষামূলক নয় বরং সক্রিয়ভাবে ধর্মকে রাজনৈতিক সাফল্যের অংশ করে তোলা।

পঞ্চম বনাম সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় কৌশলের তুলনা		
পার্থক্যের বিষয়	পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১)	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬)
প্রধান লক্ষ্য	ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা ও আত্মপক্ষ সমর্থন: বিরোধীদের ‘ধর্মহীনতা’র অভিযোগ খণ্ডন করা।	ধর্মীয় আবেগের সাথে একীভূতকরণ: অবলীলায় ধর্মীয় শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা।
তাত্ত্বিক অবস্থান	ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলামের মর্মবাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক বিতর্ক।	শাসনকার্যে আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানীর ওপর গুরুত্ব দিয়ে আবেগীয় সংযোগ স্থাপন।
বিরোধীদের জবাব	বিএনপি ও জামায়াতের সমালোচনার জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান এর আমলের ধর্মের তুলনামূলক ইতিহাস তুলে ধরা।	সরাসরি বিতর্কের চেয়ে ‘আল্লাহর মেহেরবানী’ ও ‘সালাম’ পৌছানোর মাধ্যমে ইতিবাচক ধর্মীয় ভাবমূর্তি তৈরি।
ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা	“বিসমিল্লাহর ও ধর্মের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার সংঘাত নেই”-এই সমন্বয়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান।	‘জাতীয় ঐকমত্য’ ও ‘জনগণের সেবক’ হওয়ার প্রতিশ্রুতির সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন।
গবেষক কর্তৃক প্রণীত		

নির্বাচনী ফলাফল: পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৃহৎ চারটি দলের ফলাফল নিম্নরূপ:

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার		প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	
	পঞ্চম সংসদ নির্বাচন	সপ্তম সংসদ নির্বাচন	পঞ্চম সংসদ নির্বাচন	সপ্তম সংসদ নির্বাচন
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০.০৮%	৩৭.৪৪%	৮৮	১৪৬
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০.৮১%	৩৩.৬০%	১৪০	১১৬
জাতীয় পার্টি	১১.৯২%	১৬.৪০%	৩৫	৩২
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১২.১৩%	৮.৬১%	১৮	৩
উৎস: নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন: জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ (ঢাকা: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন), পৃ.৪৮-৫০; STATISTICAL REPORT 7 TH JATIYASHANGSHAD ELECTION-1996 (Dhaka: Bangladesh Election Commission, 1996), p.9				

উল্লিখিত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদ (১৯৯১) নির্বাচনে বিএনপি মাত্র ০.৭৩% বেশি ভোট পেয়েও আওয়ামী লীগের চেয়ে ২৮টি বেশি আসনে

(১৪০ বনাম ৮৮) বিজয়ী হয়। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে ১২.১৩% ভোট লাভ করে। এ প্রসঙ্গে রাজনীতি বিশ্লেষক রওনক জাহান বলেন, “স্বাধীনতারোত্তর বাংলাদেশে এ নির্বাচনে জামায়াত এককভাবে ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং জামায়াত-ই কিং মেকার হয়ে ওঠে।”^{৫২} অন্যদিকে সপ্তম জাতীয় সংসদ (১৯৯৬) নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩.৮৪% বেশি ভোট পেয়েও বিএনপি’র চেয়ে আসন ব্যবধান ছিলো ৩০টি (১৪৬ বনাম ১১৬)। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগের ভোট শেয়ার ৭.৩৬% বৃদ্ধি পায় (৩০.০৮% থেকে ৩৭.৪৪%), যার ফলে আসন সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয় (৮৮ থেকে ১৪৬)।

নির্বাচনী ফলাফলের ওপর ধর্মীয় রাজনীতি ও অনুভূতির প্রভাব

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম সবসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে, বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে যখন ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে ধর্মীয় আইডেন্টটির দিকে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১) এবং সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬) এর ফলাফলে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যীয়, যা দলগুলোর কৌশল, ভোটারদের আবেগ এবং রাজনৈতিক জোটের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতে এই প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো:

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াত ও বিএনপি ইসলামি মূল্যবোধ ও ধর্মীয় পরিচয়ের উপর জোর দিয়ে তারা গ্রামীণ ও ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর সমর্থন অর্জন করে। জামায়াত দেশের অন্যতম প্রধান ধর্মভিত্তিক দল, আবার বিএনপি জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামী আদর্শ বহন ও প্রচার করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি: গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা অধিক প্রচার করে। বিএনপি, জামায়াতসহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে প্রচার করে।^{৫৩} যেমন (i) ২৯ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁ-তে এক জনসভায় জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বলেন, “শান্তির ধর্ম ইসলাম সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা মেনে নেয় না। ইসলামে নারী নেতৃত্বেরও স্বীকৃতি নেই। কারণ হযরত মুহাম্মদ(স.)-এর মৃত্যুর পর হযরত ফাতেমা (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) কে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দিতে দেয়া হয়নি।”^{৫৪} (ii) ৪ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় অপর এক জনসভায় তিনি (সাঈদী) বলেন-“ সমাজতন্ত্র কুফরী মতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলমানদের জন্য হারাম, অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ইসলামে বৈধ নয়। কেবল মাত্র ইসলামই মানুষের সার্বিক মুক্তি দিতে পারে।”^{৫৫} (iii) ৭ ফেব্রুয়ারি খুলনায় এক জনসভায় জামায়াতে ইসলামের নায়েবে আমির ও খুলনা-৩ আসনের প্রার্থী মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ বলেন, “একটি দল জাতির ঘাড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা চাপিয়ে দিতে চায়।”^{৫৬} এই ধরনের ধারাবাহিক প্রচারণার জবাবে আওয়ামী লীগ শক্তিশালী ও জনগ্রাহ্য পাল্টা বক্তব্য তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ধর্মীয় আবেগকে প্রাধান্য দেওয়ার রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি নিলফামারী জেলার সৈয়দপুরে এক জনসভায় তিনি বলেন, “বাংলাদেশকে অন্যের কাছে বন্ধক রেখে স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয়ার এবং সংবিধান থেকে আল্লাহর নাম মুছে ফেলার চক্রান্ত চলছে।”^{৫৭} নির্বাচনের প্রাক্কালে শুধু রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নয় সংখ্যালঘু নেতারাও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, “গণতন্ত্রের নামে পেয়েছি নির্যাতন আর ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে ধর্মহীনতা।”^{৫৮} ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে এসব প্রচারণা ও ধর্মীয় আবেগের প্রভাবের ফলে ভোটারদের বড় অংশ প্রভাবিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজয় বরণ করে। এ প্রসঙ্গে ওয়াকার্স পার্টি প্রধান রাশেদ খান মেনন বলেন, “আওয়ামী লীগের পরাজয় এ দলটির রাজনীতির প্রতিফলন। সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভোটারদের বিভাজন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান এবং দলটির বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যজনক প্রচারণা প্রভৃতি কারণে আওয়ামী লীগের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে।”^{৫৯} এক্ষেত্রে রাজনীতি বিশ্লেষক আবুল ফজল হক এর মন্তব্য প্রাধান্যযোগ্য। তিনি বলেন-

বিএনপি ধর্মকে ব্যবহার করে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে এবং সাধারণ ধর্মপ্রাণ ভোটারদের ওপর এর প্রভাব ছিল অকিঞ্চিৎকর। খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রচার করেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে “বিসমিল্লাহ” তথা ইসলাম থাকবে না। এই প্রচারণা আওয়ামী লীগকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে ঠেলে দেয় এবং নির্বাচনী পোস্টারে-ব্যানারে ইসলামী প্রতীক ব্যবহার উদ্বুদ্ধ করে। একদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ মুসলমান ভোটারদের নিকট তার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়, অন্যদিকে ইসলামী প্রতীক ব্যবহার অমুসলিম ভোটার ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

অর্থাৎ ধর্মীয় আবেগ, ভয়ভিত্তিক প্রচারণা ও প্রতীকী রাজনৈতিক ভাষার অপব্যবহারের কারণে ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে রক্ষণাত্মক অবস্থানে চলে যায় এবং এর ফলে নির্বাচনী ফলাফলে দলটির পরাজয় ঘটে।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আওয়ামী লীগ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করে-‘আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য, আদর্শ ও স্বপ্ন: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশ সংবিধানে গৃহীত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা-এর উপর প্রতিষ্ঠিত এক শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।’^{৬০} অন্যদিকে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২১-দফা সম্বলিত ইশতেহারে ‘আইনের শাসন, সরকারের জবাবদিহিতা, দূর্নীতি সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি’ প্রদান

করে।^{৬১} মূলত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের কারণে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করার নীতি পরিহার করে ধর্মীয় অনুশাসনকে প্রাধান্য দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করে। নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনার সৌদি আরবে হজ্জ পালন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বার্তা। দেশে ফিরে তিনি হিজাব পরিহিত অবস্থায় নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তৃতার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ ও শেষে ‘খোদা হাফেজ’ বলা-ওগুলো ছিল সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় অনুভব জাগানোর কার্যকর উপায়। এছাড়াও নির্বাচনী প্রচারণায়-কাবাগৃহ তাওয়াফ ও মোনাজাতরত শেখ হাসিনার পোস্টার, তসবিহ হাতে ও ধর্মীয় আবরণে তার ছবি, আল্লাহর নাম উল্লেখ করে নির্বাচনী ভাষণ সারাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এসব প্রতীকী পদক্ষেপ রক্ষণশীল ও ধর্মপ্রাণ ভোটারদের কাছে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যা আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত করতে বহুলাংশে সহায়তা করে।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (১৯৯৬) আওয়ামী লীগের অবস্থানে আরেকটি কৌশলগত সামঞ্জস্যসাধন লক্ষ্য করা যায়। সেটি হলো শেখ হাসিনা পূর্বের সেকুলার ভাষ্য থেকে সরে এসে প্রচারণায় ধর্মীয় বাক্য ব্যবহারে জোর দেন। অধিকাংশ ভাষণে ধর্মীয় শব্দ ও উক্তি বিশেষত ‘ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর মেহেরবানীতে,...’ ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬ সালের ১১ মে বিএনপি নেতা উইং কমান্ডার (অব.) হামিদুল্লাহ খান ও হাজি সেলিমের আওয়ামী লীগে যোগদান অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, “ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন আওয়ামী লীগকে জনগণ নির্বাচনে জয়ী করবে ইনশাআল্লাহ”^{৬২}; পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, একই বছরের ৩১ মে ফেনীতে শেখ হাসিনা বলেন, “আল্লাহর মেহেরবানীতে জনগণের ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সেই সরকার জনগণের সেবক হবে।”^{৬৩} এই ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা সেকুলার ইমেজ থেকে সরে এসে ধর্মীয় ভাষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে এক প্রকার ধার্মিক ও ধর্ম-সহনশীল ইমেজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।^{৬৪}

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা শুরু করেছিলেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি জিয়ারতের মাধ্যমে। কিন্তু সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা তিনি শুরু করেন সিলেটের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র শাহ জালাল (রহ.) ও শাহ পরাণ (রহ.) এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে। এই কৌশলগত পরিবর্তন-ধর্মীয় আবরণ গ্রহণ ও আধ্যাত্মিক প্রতীক ব্যবহার-জনগণের কাছে শেখ হাসিনাকে একজন ধার্মিক ও ধর্মনিষ্ঠ নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাফল্য অর্জনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ বিষয়ে ইতহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, “নির্বাচনী প্রচারের শুরুতে শেখ হাসিনা পবিত্র পুরুষদের মাজার জিয়ারত করেছেন। এটা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নজর কাড়ার জন্যই এমন নির্বাচনী প্রচার ও কৌশল।”^{৬৫}

উপসংহার

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্ম একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে, যা রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোটারদের আচরণ, মনস্তত্ত্ব ও সমর্থন কাঠামো গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। পঞ্চম (১৯৯১) ও সপ্তম (১৯৯৬) জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা কৌশল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ দুটি নির্বাচনেই ধর্মীয় উপাদান ব্যবহারে ভিন্নতর কৌশল গ্রহণ করেছিল এবং এ ভিন্নতা নির্বাচনী ফলাফলে সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মূলত আদর্শিক ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল, অথচ বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ধর্মীয় পরিচয়, ইসলামী আবেগ, নারীনেতৃত্ব বিরোধী বক্তব্য ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ‘ধর্মহীনতা’ হিসেবে প্রচারের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ধর্মভিত্তিক ভোট মোবাইলাইজেশন কৌশল গ্রহণ করে। এর ফলে গ্রামীণ ও ধর্মপ্রাণ ভোটারদের একটি বড় অংশ আওয়ামী লীগ থেকে দূরে সরে যায় এবং দলটি আসন ও ভোট-দুই ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে।

এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রচারণা কৌশলে মৌলিক পরিবর্তন আনে। দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার হজ্জ পালন, সুফি-সাধকের মাজার জিয়ারত, হিজাব ও তসবিহ ব্যবহার, বিসমিল্লাহ উচ্চারণ এবং বক্তৃতায় আল্লাহর রহমত প্রভৃতি উপাদান-সবগুলোই ধর্মীয় আবেগের সাথে রাজনৈতিক বার্তার সমন্বয় ঘটায়। এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধে সম্মান দেখানো এক ‘মধ্যপন্থী’ রাজনৈতিক পরিচয় জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বিরোধীদলগুলোর প্রচারিত ‘আওয়ামী লীগ ধর্মহীনতা চায়’-এমন প্রচারণার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। এর পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য, সুশাসন, উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দলটির গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলস্বরূপ, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ উল্লেখযোগ্য ভোট বৃদ্ধি ও আসনের সংখ্যাগত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। স্পষ্টতই দেখা যায়, ধর্মীয় আবেগকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করা এবং ধর্মীয় প্রতীকসমূহ গ্রহণ করা রাজনৈতিক বৈধতা ও নির্বাচনী ফলাফলের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

সার্বিকভাবে, বলা যায় যে বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্ম শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়; বরং এটি জনসমর্থন সংগ্রহের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কর্মকৌশল প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় প্রতীক, ধর্মীয় ভাষা এবং ধর্মীয় পরিচয়ের কৌশলগত ব্যবহার ভোটারদের আচরণ ও রাজনৈতিক সমর্থন প্রাপ্তিতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। সেই সাথে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায়ও ধর্মের এই প্রতীকী রাজনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে বিদ্যমান থাকবে-এটি অনুমান করা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

তথ্যপঞ্জি

- ১ Rounaq Jahan, *Political Parties in Bangladesh Challenges of Democratization* (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2015), pp. 24-25; Ali Riaz, *Lived Islam & Islamism in Bangladesh* (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2019), pp. 82-88.
- ২ নূহ-উল-আলম লেলিন, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ১৪৮; হাসান হাফিজুর রহমান সম্পা., *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ১৯৮২), পৃ. ১২২।
- ৩ *প্রাণ্ডক্ত*, ১৭১।
- ৪ নূহ-উল-আলম লেলিন, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৬-২৯।
- ৫ *প্রাণ্ডক্ত*, ৩৯৪।
- ৬ আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি সংঘাত ও পরিবর্তন (১৯৭১-১৯৯১)* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪), পৃ. ৩৬৭-৩৬৮।
- ৭ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে উক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া বিরোধী দলসমূহের চরম বাধার সম্মুখীন হয়। আওয়ামী লীগসহ বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। তবে নির্বাচনে বিএনপিসহ ৪১টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। অন্য ৪০টি দলের মধ্যে গণঅধিকার ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জনতা পার্টি, মুসলিম লীগ (জমির আলী) এনডিপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ, ফ্রীডম পার্টি, জাতীয় মুক্তি দল, মুসলিম লীগ, জনদল, ইউ ডি এ, ডেমোক্রেটিক লীগ, ন্যাশনাল ফ্রন্ট, বেকার সমাজ, দেশপ্রেমিক জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা, মাওলানা ভাসানী স্বপ্ন বাস্তবায়ন পরিষদ, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনসহ অন্যান্য দলগুলোর পরিচিতি ও গণভিত্তি খুবই দুর্বল এবং নাম সর্বস্ব। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৩ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদানকৃত ভাষণে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের অঙ্গিকার করেন। সেই অঙ্গিকার মোতাবেক সারারাত আলোচনা পর ২৫ মার্চ ভোরে সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং ৩০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। দেখুন-Md. Abdul Mannan, "The February 1996 Parliamentary Election: A Quest for Constitutional Democracy", *Asian Studies*, No. 15(1996), pp.67-83; সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি* (ঢাকা: অন্যধারা, ২০২০), পৃ. ৪১-৪৩; *দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ জানুয়ারি ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জানুয়ারি ১৯৯৬।
- ৮ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ৯ মহিউদ্দিন আহমদ, *খালেদা* (ঢাকা: অনন্যা, ২০২৫), পৃ. ১২৯; *প্রাণ্ডক্ত*, ৪ জানুয়ারি ১৯৯১; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ১০ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ১১ *দৈনিক মিল্লাত*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ১২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ১৩ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ১৪ *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১; *দৈনিক মিল্লাত*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

- ১৫ দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ জানুয়ারি; ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ১৬ সংবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ১৭ দৈনিক খবর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ১৮ দৈনিক মিল্লাত, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ১৯ দৈনিক মিল্লাত, ১২ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ২০ দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ২১ দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ২২ দৈনিক ইনকিলাব, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ২৩ প্রাণ্ডক্ত, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ২৪ প্রাণ্ডক্ত, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ২৫ দৈনিক মিল্লাত, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ২৬ প্রাণ্ডক্ত, ১২ জানুয়ারি; ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১; আবু সাঈদ খান, লোগানে লোগানে রাজনীতি (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০০), পৃ. ১৪৮।
- ২৭ প্রাণ্ডক্ত, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ২৮ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশ: রাজনৈতিক সংস্কৃতি (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ১৫২।
- ২৯ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ৩০ দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ মে ১৯৯৬।
- ৩১ দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ মে ১৯৯৬।
- ৩২ প্রাণ্ডক্ত, ১৮ মে ১৯৯৬।
- ৩৩ ভোরের কাগজ, ৩ জুন ১৯৯৬; দৈনিক ইনকিলাব, ১ জুন ১৯৯৬।
- ৩৪ দৈনিক ইনকিলাব, ৬ জুন ১৯৯৬।
- ৩৫ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ মে ১৯৯৬; ভোরের কাগজ, ১৫ মে ১৯৯৬; দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ মে ১৯৯৬; সংবাদ, ১৫ মে ১৯৯৬।
- ৩৬ দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ মে ১৯৯৬।
- ৩৭ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ মে ১৯৯৬; দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ মে ১৯৯৬; দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ মে ১৯৯৬।
- ৩৮ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মে ১৯৯৬।
- ৩৯ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ মে ১৯৯৬।
- ৪০ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ মে ১৯৯৬।
- ৪১ দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জুন ১৯৯৬।
- ৪২ আবু সাঈদ খান, লোগানে লোগানে রাজনীতি (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০০), পৃ. ১৪৮; ভোরের কাগজ, ১ জুন ১৯৯৬।
- ৪৩ দৈনিক মিল্লাত, ১৯ মে ১৯৯৬।
- ৪৪ দৈনিক দিনকাল, ৯ জুন ১৯৯৬।
- ৪৫ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশ: রাজনৈতিক সংস্কৃতি (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ১৫২; দৈনিক বার্তা, ৬ জুন ১৯৯৬।
- ৪৬ দৈনিক সংগ্রাম, ৪ জুন ১৯৯৬।
- ৪৭ প্রাণ্ডক্ত, ৩ মে ১৯৯৬।

- ৪৮ Enayetur Rahim, “Electoral Politics in Bangladesh”, Rafiuddin Ahmed (ed.), *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh* (New Delhi: South Asian Publishers, 1990), p. 109.
- ৪৯ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৯৬: নির্বাচনী ইশতেহার* (ঢাকা: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, ১৯৯৬); উদ্ধৃত- মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, “ধর্মীয় রাজনীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ”, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, বার্ষিক বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৪২৫/২০১৭-১৮, পৃ. ১২৩।
- ৫০ দৈনিক মিল্লাত, ২৭ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ৫১ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ৫২ Rounaq Jahan, *Political Parties in Bangladesh: Challenges of Democratization* (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2015), P.37; Rounaq Jahan, “Political Parties Movements, Elections and Democracy in Bangladesh”, *Gyantapas Abdur Razzaq Distinguished Lecture*, 27 January 2018, p.10;
- ৫৩ মো. এমরান জাহান ও মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪* (ঢাকা: অবসর, ২০১৮), পৃ. ১৯৬।
- ৫৪ দৈনিক জনতা, ৩০ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ৫৫ দৈনিক সংগ্রাম, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ৫৬ দৈনিক সংগ্রাম, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ৫৭ দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ৫৮ প্রাগুক্ত, ৭ জানুয়ারি ১৯৯১।
- ৫৯ আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, *গণতন্ত্রের অন্বেষণ বাংলাদেশ* (ঢাকা: পাণ্ডুলিপি, ১৯৯৩), পৃ. ১১৫; উদ্ধৃত- সুলতান মাহমুদ, *বাংলাদেশ রাজনৈতিক উন্নয়ন (১৯৯১-২০০১)* (ঢাকা: বটেশ্বর বর্ণন, ২০১৯), পৃ. ৯৩।
- ৬০ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১; দৈনিক ইনকিলাব, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ৬১ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ মে ১৯৯৬; দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ মে ১৯৯৬; দৈনিক ইনকিলাব, ১১ মে ১৯৯৬।
- ৬২ দৈনিক ইনকিলাব, ১২ মে ১৯৯৬।
- ৬৩ ভোরের কাগজ, ১ জুন ১৯৯৬।
- ৬৪ হাফিজ আহমেদ, “সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ডানপন্থী রাজনীতি: নির্বাচনী প্রচারণার ভাষ্য ও প্রভাব”, *Rajshahi University Journal of Arts & Law* 54 (1): 155-79. <https://doi.org/10.64102/rujal.0736>
- ৬৫ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি* (ঢাকা: অন্যধারা, ২০২০), পৃ. ৬৩।